সবুজ স্বপ্ন ও কানাই পাখিরা

দিলীপ পাল

এক

বহুবছর পরে পুলিশ এল গ্রামে। গ্রামের শেষে আষাঢ়ে-খাল, তার পরেই অন্য জেলা। ফলে এই গ্রামের ভিতর দিয়ে থানার অন্য গ্রামে যাবার দরকার হলেও লোকে অন্তত জিপগাড়ির ভিতরে বসে থাকা পুলিশের উর্দি বা বন্দুকের নল দেখতে পেত। এই ছোটো গ্রামে ভোটের বুথও নেই যে পুলিশের আসার দরকার হবে। এখানে চুরির ঘটনা আকছার ঘটে, কিন্তু সেসব ছিঁচকে চুরিই বটে। কলাকাঁদি, খেজুর রস, পুকুরঘাটে ভিজতে দেওয়া কাঁসা-পেতলের বাসন এইসব। অবশ্য দিনেরাতে দীর্ঘ হচ্ছে তালিকা, যোগ হয়েছে ধান-চাল, সাইকেল, রেডিয়ো আর খেতের পাকা ফসল। কিন্তু এ পর্যন্ত এই গ্রামে ডাকাতি বা খুনখারাপির কোনো ঘটনাই ঘটেনি যে লোকে গ্রামে বসেই পুলিশ দেখবে। এসেছিল লেভির সময়, আর এই এল কত বছর পরে।

গ্রামে পুলিশ আসছে তা বাচ্চাদের চেঁচামেচি থেকে সঠিক আন্দাজ করে, কিংবা চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে ভুরুর উপর ছাউনি-করা হাতের চেটো ঢেকে, আধমাইলটাক দূরে যাত্রাদলের সাহেব পুলিশের মতো হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট পরে বীরপুরুষের মতো গটগট করে আসতে থাকা দারোগা সাহেবকে দেখে নিয়ে কেউ গায়ে জামা চড়িয়েছে, কেউ-বা ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে। সবাই জানে, যে কারণেই আসুক, দারোগা সাহেব এসে বসবেন বড়োকত্তার বৈঠকখানায়। কেননা বলার মতো, দারোগা কি বিডিও অফিসের গ্রামসেবক কী নতুন নতুন ইস্কুলের ছেলেধরা মাস্টার — কাউকে বসানোর মতো চেয়ার-টেবিল-সহ বৈঠকখানা বলতে ওই একটিই।

বাড়িঘরের লাগোয়া উঁচু জমিতে আউশ ধান কাটা বা আশ্বিনের রোদে উলটে-পালটে কাঁচাপাকা খড় শুকানোর কাজ ছেড়ে গায়ে ঘাম-নুন মাখা যত মনিব-মুনিষ, ঘরের উঠোন থেকে উঁকি দিতে দিতে লাঠি ঠকঠক করতে করতে এগোনো সাবধানী অথচ সাহসী বৃদ্ধ, ঘোমটার আড়ালে ভয় ও কৌতূহল ঢাকতে ঢাকতে মা-বউদের দল এবং বিপুল চেঁচামেচি করতে করতে দুরন্ত বাচ্চারা বড়োকত্তার বৈঠকখানায় জড়ো হতে হতে দারোগা সাহেব এলেন। বড়োকত্তাকে স্যাল্যুটের কায়দায় নমস্কার করে, পেতলের গাড়ুতে রাখা কুয়োর জলে হাতমুখ ধুয়ে, ভাঁজকরা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তোয়ালে-ঢাকা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন। বড়োকত্তার গেঞ্জি পরা বাগালের হাতে সাঁই সাঁই করে বাওয়ানো তালপাখার হাওয়া খেতে খেতে দারোগা সাহেব বললেন, 'কানাই পাখিরা কি পাকা চোর?'

বড়োকত্তা তো বটেই, গ্রামসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে হতবাক। বলেন কী দারোগা সাহেব? কানাই পাখিরা তো চোরই নয়, তার আবার কাঁচা নাকি পাকা!

জনতার মধ্যে গুঞ্জন তীব্রতর হতে থাকল। এ কী ব্যাপার! কানাইয়ের মতো একটা নিপাট সজ্জন লোকের নামে চুরির বদনাম! বদনাম হলেও না হয় কথা ছিল। এ তো রীতিমতো থানা-পুলিশের ব্যাপার!

হঠাৎ করে হাজির হল অশ্বিনী সামন্ত, দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'ভুল করছেন আপনারা। কানাই পসে কখনো চুরি করতেই পারে না। হয় ভুল করছেন, নয়তো মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করাতে এসেছেন। কেউ নিশ্চয় কোনো কুমতলবে ফাঁসাতে চায় ওকে।'

প্রায় সকলেই শোকে মুহ্যমান। চরম বিস্ময়ে হতবাক। কানাইয়ের নামে চুরির অভিযোগ হতে পারে তা কারোর বিশ্বাসের মধ্যে তো দূরের কথা, ধারণার মধ্যেও আসে না। কিন্তু তাকে ফাঁসাবেই বা কে? কেনই বা? সে কারোর কাঁচা ধানেও মই দেয় না। কারোর সঙ্গে গলা উঁচিয়ে কথা বলে না। কাউকে ঠকায় না, কাউকে চটায় না। কারোর কাছে কিছু ধার চায় না যার ফলে কারোর কাছে একটি পয়সাও ধারে না। আলপথে মুখোমুখি হয়ে পড়লে জমিতে নেমে বা শরীরটা যতটা সম্ভব মুচড়ে মূল পথ থেকে সরে গিয়ে পথ করে দেয়, বলামাত্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই কানাই কিনা ... গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকল যুগপৎ বিস্ময় ও হাহাকার।

বৈঠকখানা থেকে খানিক তফাতে দু-হাতে চোখ ঢেকে আলের মাথায় বসে আছে কানাই। কানাইয়ের ভগ্নীপতি বিপিন কবরেজের একটা বিষণ্ণ হাত কানাইয়ের কাঁধে, তার মুখে বুঝি সান্ত্বনার ভাষা নেই। ওদিকে বড়োকত্তা আর দারোগা সাহেবের মধ্যে নিচুস্বরে আলোচনার সারমর্ম বোঝার চেষ্টায় উৎকর্ণ লোকজনের ধৈর্যচ্যুতি স্পষ্ট হচ্ছে। এমন সময় ভিড় কাটিয়ে এসে দাঁড়াল ছোটোকত্তা, তার পিছনে পিছনে এক পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুতই এসে জুটল ল্যাংড়া গজেন ওরফে গজেন মিদ্যে। একইসঙ্গে ডাক পড়ল বিপিন কবরেজ আর কানাইয়ের। সবক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা-বিলাসী বড়োকত্তা কণ্ঠস্বরকে বৈঠকখানার উঠোনে সমবেত পায়রার বকবকম ছাপানো পোশাকি উচ্চতায়, শিষ্টতায় এবং একইসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যে তুলে বললেন, 'শোনো বিপিন, শোনো কানাই, আর তোমরাও শোনো। কানাইয়ের নামে যে চুরির অভিযোগ উঠতে পারে আমাদের সকলেরই চিন্তার বাইরে। তবুও প্রত্যেক অভিযোগেরই তদন্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। কে অভিযোগ করেছে, কেন করেছে তার চেয়ে বড়ো কথা হল অভিযোগটা উঠেছে। আর অভিযোগটা যখন উঠেছে তখন তদন্ত হয়েই প্রমাণ হোক না যে এটা সম্পূর্ণ ভুল!'

বড়োকত্তা আর গজেনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটা দেওয়ানি মোকদ্দমার বিষয়ে দুজনের মধ্যে একটা সম্ভাব্য সন্ধির গন্ধ বাতাসে ভাসছিল। সেই গন্ধটা বড়োকত্তার মধ্যপন্থা-সুলভ কথার মধ্যে আঁচ করেই অশ্বিনীদা বলল, 'কে করেছে অভিযোগ? কেন করেছে? আগে আমাদের সেটা জানতে হবে।'

জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল — 'কে করেচে অভিযোগ? ক্যানে করেচে? আগে আমাদেরকে সেইটে জানাতে হবে।'

'শান্ত হও তোমরা, শান্ত হও।' পুরোহিতের শান্তিজল ছেটানোর ভঙ্গিতে শান্তভাবে বললেন বড়োকত্তা।

'অভিযোগটা কি গজেন মিদ্যে করেছে?' গর্জে উঠল অশ্বিনীদা। 'গজেন মিদ্যের মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

'আঃ! শান্ত হও সকলে। শান্ত হ অশ্বিনী। সবটা শুনতে হবে তো, না কী? তোমরা তো জানো, গজেনের বাড়ি থেকে একমণ চালের বস্তা আর গোয়াল থেকে একটা ছাগল চুরি হয়ে

গেছে। তাই সে থানায় ডায়েরি করতে গিয়েছিল। থানাতে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল কাউকে সন্দেহ হয় কি না। গজেন না-ই বলেছে। তারপর যখন জিজ্ঞেস করেছে, গ্রামে সম্প্রতি কোনো চুরির ঘটনা ঘটেছে কি না, তখন গজেন স্বাভাবিকভাবেই ছোটোকত্তার সেদ্ধধান চুরির ঘটনার কথা পেড়েছে। আর, যেহেতু কানাইয়ের নামটা সেই ঘটনায় জড়িয়ে গিয়েছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ সন্দেহবশত কানাইয়ের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চায় আর কি!'

বিষয়টি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল করার জন্য দারোগা সাহেব মুখ খুললেন, 'আসলে দাগি আসামিকে আমরা এরকম ক্ষেত্রে একটু আধটু জেরা-টেরা করি।'

'দাগি আসামি!' এবার মুখ খুললেন ছোটোকত্তা। 'আমার ধান শুকানো খামার থেকে আধমণ সেদ্ধধানের একটা বস্তা পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিকই। বস্তাটা খুঁজতে খুঁজতে কানাইদার মাচানের সামনে থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেটাও ঠিক। কিন্তু আমরা তো বিশ্বাসই করিনি যে সেটা কানাইদার কাজ হতে পারে। সেদিন সন্ধেবেলা কানাইদা মোকাম থেকে ফিরে গোয়ালে গোরুকে খেতে দিয়ে চান করে কাপড় পালটাতে ঝুরিবটতলায় তার মাচানে গিয়েছিল এটাও ঠিক। কিন্তু সেই ফাঁকে সে আধমণ ধানের বস্তাটা তার মাচানে রেখে এসেছিল এটা একেবারেই সম্ভব নয়। কানাইদা আমার বাড়িতে আজ বিশবছর ধরে কখনো বছর-বাঁধা কখনো নাঁগাড়ে মুনিষ হিসেবে কাজ করে, সে আমার চাষের ধান-চাল-আলু-তিল বেচতে মোকামে যায়, পাই-পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু কখনো দেখিনি বা মনেই হয়নি যে সে খারাপ কিছু করতে পারে। সেইজন্যে আমি তো থানায় অভিযোগ জানাতে যাইনি, দোষ দিইনি তাকে। প্রমাণ নাই, কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি যে কানাইদাকে বেইজ্জত করার জন্যে ওই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। এ পর্যন্ত কানাইদার নামে তো কেউ কখনো অভিযোগ করেনি থানায়। তাহলে সে দাগি হয় কী করে দারোগা সাহেব?'

'দাগি হয় কী করে?' স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা।

'এসব হল গজেন মিদ্যের কারসাজি!' চিৎকার করে ওঠে অশ্বিনীদা।

'তারও কোনো প্রমাণ নেই অশ্বিনী। শুনলি তো, গজেন কানাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। চুরির প্রসঙ্গে আলোচনার পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই —'

'কানাই পিসেকে ছেড়ে দিন, প্লিজ!' বড়োকত্তাকে থামিয়ে দারোগা সাহেবের কাছে গিয়ে জোড়হাতে অশ্বিনীদা কাকুতি-মিনতি করতে থাকল।

বিপিন কবরেজের কোমর-পড়া বুড়ি মা লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে এসে বলল, 'ওরে ও আহাম্মুকের দল! কানাই আমার করবে চুরি? খিদেয় পরান বেরিয়ে গেলেও যে একমুঠো ভাত মেগে খেতে পারেনি সে করবে চাল চুরি? ছাগল চুরি? ওরে ও আবাগির বেটা ঢেমনা গজা, তোর কি একটুনও ধম্যিগম্যি থাকতে নাই?'

'বেশ বলেচে, ঠিক বলেচে!' বলতে বলতে রাগে আর দুঃখে কাতর হয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে কেউ বলে ওঠে, 'ধম্মে সইবেনি মা শীতলা! মানুষটাকে রক্ষে করো বাবা খুদিরায়!'

'আপনাদের বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে কোথাও। কানাই পিসেকে ছেড়ে দিন, প্লিজ!' অশ্বিনীদা ফের কাকুতিমিনতি করতে থাকল।

'কানাই পাখিরা কি আপনার পিসেমশায়?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে ওর ব্যাপারে আপনার এত ইন্টারেস্ট কেন অশ্বিনীবাবু?'

'ওঃ হো! বলাই হয়নি, অশ্বিনী, অশ্বিনী সামন্ত এই গ্রামের এক সুযোগ্য সন্তান। ব্যাঙ্কে চাকরি করে, জেলা সদরে থাকে। ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ি এসেছে কাল। কাল-ই তো না কি রে বাবা অশ্বিনী? যাইহোক, একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে দারোগা সাহেব। এই গ্রামে “সবুজের অভিযান” নামে একটা ক্লাব আছে। অশ্বিনী এখনও কাগজে কলমে তার সম্পাদক। ওরা বেশ কিছু ভালো (ভালো শব্দটায় বিশেষ জোর দিয়ে) কাজ করেছে। কানাই নাকি ওদের ক্লাবের স্তম্ভস্বরূপ।'

'ও, আচ্ছা! তাহলে এসব ব্যাপারে কি ক্লাবেরও হাত আছে নাকি অশ্বিনীবাবু?' ভুরু কুঁচকে বললেন দারোগা সাহেব।

'না না না, ভুল করছেন দারোগা সাহেব।' সচেতন হয়ে কণ্ঠস্বরে মোচড় দিলেন বড়োকত্তা। 'এ সবের মধ্যে ওরা নেই। ওরা নাকি বিপ্লব করে, সবুজ পৃথিবী ওদের স্বপ্ন, ওদের যাত্রাপালার নাম *সবুজ স্বপ্ন*। পালাকার কে জানেন? শ্রীমান অশ্বিনী সামন্ত।'

বাঁকা চোখে তাকালেন দারোগা সাহেব। তাকে ইশারায় আশ্বস্ত করলেন বড়োকত্তা। ইতোমধ্যে একজন সেপাই আর পাশের গ্রামের সুলেমান দফাদার এসে হাজির।

বড়োকত্তার বিশেষ অনুরোধে বাড়ির ভিতরে গিয়ে, জলখাবার খেয়ে, বৈঠকখানায় ফিরে দারোগা সাহেব বললেন, 'এবার উঠতে হবে।' তারপর কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনীদাকে বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে যে কানাই খুব ভালো মানুষ! তবে কিনা, বুঝলেন তো, আইনের বালাই। আইনকে তো তার কথা বলতেই হবে, আইনকে তো তার পথ চলতেই হবে! ও কানাই, ভয়ের কিছু তো নাই। চলো হে, যাই এবারে।'

সামনে সুলেমান, মাঝে কানাই, পিছনে সেপাই, সব শেষে দারোগা সাহেব। শোকে কাতর গ্রামকে পিছনে ফেলে, কানাইদের পিছনে পিছনে খালধার পর্যন্ত গেল বিপিন কবরেজ, 'সবুজের অভিযান'-এর কয়েকজন সদস্য আর কানাইয়ের সব সময়ের ছায়াসঙ্গী কাল্টু। গ্রাম ছাড়িয়ে কুলিরাস্তার মাঝামাঝি যেতেই দেখা গেল, কানাইয়ের কোমরে দড়ি বাঁধছে সুলেমান আর সেপাই। ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ জানাল কাল্টু। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেল সুলেমান। ঘেউ ঘেউ ছেড়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে তফাত রেখে সঙ্গ নিল কাল্টু, সেই থানা পর্যন্ত।

বড়োকত্তা একটা চিঠি লিখে দিয়েছেন তার বড়ো জামাইকে। বড়ো জামাই কৃষক সভার মাঝারি নেতা। চিঠি নিয়ে ছোটোকত্তা, বিপিন কবরেজ আর অশ্বিনীদা থানার সামনে সারাদিন ধরনা দিয়ে, কোর্টে গিয়ে উকিল ধরে, জামিনের ব্যবস্থা করে কানাইকে উদ্ধার করে আনল। অশ্বিনীদার শালার মোটরবাইকে চড়িয়ে কানাইকে গ্রামে আনতে হল। কেননা, হাজতবাসের সময় অপরাধ কবুল না করা এবং থানার কোনো চাহিদাই পূরণ করতে না পারার অপরাধে কানাইকে স্বাভাবিকভাবে বেধড়ক পেটানো হয়েছিল। ব্যস্ততার কারণে বড়োকত্তার বড়ো জামাইয়ের দেখা

পাওয়া যায় থানার হাজত থেকে কানাই ছাড়া পাবার পর। কানাইকে বিপিন কবরেজ আর অশ্বিনীদার কাঁধে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে মোটরবাইকে উঠতে হয়েছিল।

গ্রামে ফিরে কানাই সকলকে এড়িয়ে চলে। যখনই কেউ তাকে দেখতে পায়, দেখতে পায় তার দু-চোখ দিয়ে বয়ে চলা অবিরত ধারাস্রোত। কখনো খালের ধারে, কখনো ঘটক-পুকুরের পাড়ে তারই মানুষ করা গাছের ছায়ায়, কখনো আষাঢ়ে-বাঁধের চাতালে, আর অন্ধকার নামলে গ্রামের প্রান্তে ঝুরিবটতলায় তার মাচানের উপর ছই-ঘরে শুয়ে থাকে সে। সবসময় বিড় বিড় করে কার সঙ্গে কথা বলে। দিনমানে ক্লাবের ছেলেরা তাকে গ্রামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বড়োজোর কিছু খাবার দিলে সে নিয়ে নেয়, ইঙ্গিতে বলে যথাসময়ে খেয়ে নেবে। পুরোনো তামার রঙে অন্তর-পোড়া ছাইয়ের প্রলেপ জমে জমে আধপোড়া কাঠের মতো হয়ে গেছে কানাই।

আশ্বিনের শেষে মাঠে আর তেমন কাজ নেই। আউশ ধান কাটা হয়ে গেছে। শুকিয়ে তোলা হয়ে গেছে খড়বিচালি। আলু চাষের জন্য মাটি তৈরির কাজ চলছে ধীরলয়ে। বেশিরভাগ আউশ খেতে এখনও চেটো-ডোবা কাদা। এইসময় খেতমজুরের কাজ কম। ফসল পাহারার কাজ শুরু হতেও ঢের দেরি। গ্রামে যেটুকু কাজ আছে সবই খুব শৌখিন ধাতের। যেমন ঢ্যারা দিয়ে সদ্য-শুকানো শনের সুতো কাটা, গোরু বাঁধার বা কুয়োর জল তোলার জন্য দড়ি পাকানো, ধান ঝাড়ার জন্য বাঁশের আগড় বোনা। বর্ষায় ধুয়ে-ক্ষয়ে যাওয়া ধান সেদ্ধ করার জন্য দু-পাকা কি চারপাকা উনুনে মাটি ধরানো কিংবা বসতবাড়ির গাংদেয়ালে পচানো কাদা লেপা। এই সমস্ত কাজেই কানাই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সব্বাইকে জবাব দিয়ে দিচ্ছে কানাই।

একদিন খুব সকাল সকাল কানাই হাজির হল ছোটোকত্তার, অর্থাৎ আমাদের বাড়ির উঠোনে। অন্য সময় হলে মুনিষদের খেতে বসার জন্য তারই বানানো একটা তালপাতার চাটাই দেয়ালের আংটা থেকে খুলে নিয়ে ছাঁচায় পা ঝুলিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দুয়ারে বসত সে। আজ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল। শুধু একবার বলল আমাকে, ‘কলকাতা থেকে কালকে বাড়ি এসেচো জানি। কিন্তু অত রাত করলে ক্যানে খোকাবাবু? বড্ড ভয় করে গো!’

মা বলল, ‘ঠাকুরজামাই, মানী লোক তুমি। তাই মানে আর মনে বড্ড লেগেছে। সবকিছু ভুলে যাও ঠাকুরজামাই। কাজে মন দাও আবার, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

আমি বললাম, ‘একটা কথা ভেবে দেখ পিসে। গোটা গ্রামটাই তো ছিল আর আছে তোমার সঙ্গে। এটা ঠিক তো?’

‘আমাকে তোমরা আটকিওনি খোকাবাবু। অশ্বিনীবাবু আমার সঙ্গে কথাই বলচেনি রাগ করে। আসলে খোকাবাবু, আমার মনটাই মরে গেছে। চলে যাব আমি গেরাম ছেড়ে।’

‘যাবে কোথায়?’

‘আরামবাগ।’

‘কী করবে সেখানে?’

‘রাইস মিলে কাজ করব।’

‘বয়স তো হল ষাটের কাছাকাছি। সইবে এই বয়সে রাইস মিলের খাটুনি?’

'দেখি!'

'এগুলোর কী হবে পিসে?'

'কোনগুলোর?'

'জিজ্ঞেস করছ?'

কানাই মাথা নিচু করে নিজের ভিতরে ছটফট করতে থাকে, যেন কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ভিতরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে কেউ।

ঘরের ভিতর থেকে একটা পুরোনো ফুল শার্ট আর কয়েকটি পাঁচটাকার নোট এনে কানাইয়ের হাতে ধরিয়ে ছোটোকত্তা অর্থাৎ আমার বাবা ভারী গলায় বলল, 'এগুলো রাখো কানাইদা। যেখানে থাকবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে। যদি কোনোদিন প্রাণ চায় তো ফিরে এসো। যদ্দিন বাঁচবে, আমার বাড়িতে কাজের ও ভাতের অভাব হবে না।'

একটা কাপড়ের থলিতে মা এনে দিল সেরটাক চিঁড়ে, আর অ্যালুমিনিয়ামের একটা পুরোনো কৌটো ভরে খানিকটা আখের গুড়। আমি বললাম, 'একটু দাঁড়াও পিসে।'

প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের একদিকের দেয়াল থেকে নামানো টিনের চাল দেওয়া ক্লাবঘরের পাকা দেয়ালটি জুড়ে আমারই আঁকা 'সবুজের অভিযান'। দেয়ালে রং-তুলি দিয়ে আঁকার আগে আর্ট পেপারে এঁকেছিলাম একই ছবি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় খুবই কাঁচা হাতে আঁকা গ্রাম গঠনের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। উদীয়মান সূর্যের আভায় জেগে উঠছে আমাদের গ্রাম। হালকা আকাশি ও কমলা রংয়ের মিশেল দেওয়া উজ্জ্বল আকাশের নীচে খড়-টিন-অ্যাসবেস্টসের ছাউনিগুলোকে ছাপিয়ে উঠেছে ঘনসবুজ বৃক্ষসারির প্রসারিত অহংকার। বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খালে, বাঁধে, অজস্র ছোটোবড়ো জলাধারে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে ঘন নীলের রেখা। ছবির মাঝখান জুড়ে সবুজ আর সোনালি শস্যখেত। খুব খুঁটিয়ে দেখলে যে কোনো গ্রামবাসী চিনতে পারবে ঝুরিবটগাছটিকে, যাকে ফুঁড়ে ও জড়িয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে নিজেকে জাহির করছে সফলা তালগাছটি।

ঝুল আর ধুলো ঝেড়ে, ভাঁজ খুলে, ছবিটা এনে মেলে ধরলাম কানাইয়ের সামনে। বললাম, 'এটা নিয়ে যাও তাহলে।'

'এই ছবি নিয়ে আমি কী করব খোকাবাবু? এ তো আমার বুকের ভিতরে আঁকা আছে গো!'

'তাহলে? চলে যাচ্ছ যে! চলেই যখন যাচ্ছ, তখন নিয়ে যাও এটা।'

কাঁপা হাতে ভাঁজে ভাঁজ ফেলে আর্ট পেপারটা নিয়ে নিল কানাই।

ভোর ভোর অশ্বিনীদা আর আমি ঝুরিবটতলার মাচানে গিয়ে দেখি, একেবারে চলে যাবার যাবতীয় চিহ্ন রেখে একেবারেই চলে গেছে কানাই। অশ্বিনীদা তার শালার মোটরবাইকে চড়ে আরামবাগ থেকে বর্ধমান আর তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটা রাইস মিলে খোঁজ নিয়েছে। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তার।